ন্যাশনাল কমিটি ফর সিভিল রাইটস
জাতীয় ইনসাফ কায়েম কমিটি
প্রস্তাবনা

এক

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার তথা 'ইনসাফ' কায়েমে সক্ষম একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধ করেছিলাম। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রই তার প্রমাণ। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার কোন কাগুজে মতাদর্শ ছিল না, বরং সেটা ছিল বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের ঐতিহাসিক ও আইনী ভিত্তি। কিন্তু ইনসাফ কায়েমের আশা স্বাধীনতার বায়ান্ন বছরেও অধরা রয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা একটা নতুন রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসাবে আবির্ভূত হলেও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও বাহাত্তরের সংবিধানের পরস্পর বিরোধী অবস্থান জনগণকে বিভক্ত করেছে। ১৯৭০ সালে নির্বাচন হয়েছিল লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারের অধীনে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের জন্য।

একই সঙ্গে ইসলামকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিপক্ষ তৈরি করে আজ অবধি যে গৃহদাহ জারি করা হয়েছে তার ফলে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক জনগোষ্ঠি হিসাবে বাংলাদেশের পরিগঠনকে সব সময়ই ব্যাহত করা হয়েছে। শুধু ইসলাম নয়, সকল ধর্মেরই ধর্মপ্রাণ মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে যেমন অস্বীকার করা হয়েছে তেমনি একইভাবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশকেও ধর্মের বিপরীতে স্থাপন করে তাদের বিকাশ, পারস্পরিক সমঝোতা ও সৌহার্দ্যকে নষ্ট করে ধর্মকে স্রেফ পরিচয়সর্বস্ব সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত করা হয়েছে। এর ফলে মানুষের ইহলৌকিক বিকাশে ধর্মের ভূমিকা রুদ্ধ হয়েছে, তেমনি নৈতিক ও আত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রগুলোকেও ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। অথচ আমাদের দরকার রাজনৈতিক জনগোষ্ঠি হিসাবে গভীর সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য ও নৈতিক বিকাশের সাধারণ ও সার্বজনীন সূত্রের অন্বেষণ। ঔপনিবেশিক আমলের উচ্চবর্ণের হিন্দুর সংস্কৃতিকেই বাঙালি সংস্কৃতি গণ্য করে তথাকথিত বাঙালি ছাড়া অন্য সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকারও অস্বীকার করা হয়েছে। অথচ বাংলায় সনাতন ঐতিহ্য ব্রাহ্মণ্যবাদী নয়।

বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিভাজন, অনৈক্য এবং সংঘর্ষ জারি রেখে আমাদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক বিকাশ রুদ্ধ করবার এই পথ থেকে আমাদের অবশ্যই বের হয়ে আসতে হবে।

এরপর ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ক্রমাগত চলেছে সংবিধানের অদ্ভূত কাঁটাছেঁড়া, একদলীয় শাসন, সামরিক ও বেসামরিক একনায়কতন্ত্র কায়েম, মৌলিক ও মানবাধিকারের চরম লংঘন সর্বোপরি পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানকে একদলীয় মেনিফেস্টোতে রূপান্তর দেশকে গভীর সংকটে ফেলে দিয়েছে। সংবিধান এখন জুলুমের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, যা ঔপনিবেশিক আমলের পরাধীনতা ও অত্যাচারকেও হার মানায়। আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত নাগরিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বাংলাদেশের জনগণকে পরিকল্পিত ভাবে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। বাংলাদেশকে চরম মানবাধিকার লংঘনকারী দেশে পরিণত করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ রাজনৈতিক কর্মীর ওপর মিথ্যা মামলা, আইন বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং গুম খুনের জন্য বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে নিন্দিত। বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াসহ বহু রাজবন্দি এবং আলেম সমাজের উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ আজ কারাগারে। এই অবস্থার দ্রুত অবসান হওয়া দরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন ও বিয়োজনের রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যে নতুন জাতীয় নির্বাচন এগিয়ে আসছে, তার আগে এই সকল গোড়ার সমস্যা সমাধানের কথা আমাদের বলতে হবে। তাই রাষ্ট্র ও সংবিধান সংস্কারের দাবিও জোরেশোরেই আজ অনেকের পক্ষে উচ্চারিত হচ্ছে। এসব দাবি ন্যায়সঙ্গত। তবে শুধু সংবিধান সংস্কারের পদক্ষেপ অথবা রাষ্ট্র মেরামতের বিক্ষিপ্ত উদ্যোগে সমস্যার সুরাহা হবে না। গণতন্ত্র মানে ‘নির্বাচন’ না, গণতন্ত্র

রাষ্ট্রের বিশেষ রূপ বা ধরণ যা রাজনৈতিক জনগোষ্ঠি হিশাবে জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের রাজনৈতিক, আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার সংস্থা। গণতন্ত্র কায়েম না থাকলে নির্বাচন অন্তঃসারশূন্য। যেখানে সাংবিধানিক ভাবেই জনগণের কোন নাগরিক ও মানবিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার নাই সেই ক্ষেত্রে সেই সকল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকার আদায় করাই গণতান্ত্রিক রাজনীতি। নির্বাচন জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা প্রকাশের মাধ্যম। ঠিক তেমনি সভা, সমাবেশ, বিক্ষোভ আন্দোলন জনগণের ইচ্ছা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রধান মাধ্যম। তাই আসল কাজ বাদ দিয়ে নির্বাচনসর্বস্ব চিন্তা অন্তঃসারশূন্য, অকার্যকর ও গণবিরোধী। যদি রাষ্ট্রের জন্মের পর আমরা আমাদের ঐতিহ্য, বুদ্ধিবৃত্তিক, দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ড অনুযায়ী রাষ্ট্রের ‘গঠনতন্ত্র’ (Constitution) নির্ণয় করতে পারতাম, তাহলে আজ বাংলাদেশের এ দুর্দশা ঘটত না। দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তিশালী দেশ হিসাবে গর্বের সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

অতএব আমরা গোড়ার সমস্যা মোচন করে সফল অভিযাত্রায় এগিয়ে যেতে চাই। বিভক্তি ও বিভাজনের অপরিণামদর্শী রাজনীতি চাই না, ভারতসহ কোন দেশেরই মোসাহেবি আমাদের কাম্য নয়। বাক, ব্যক্তি, বিবেক, চিন্তা, মত প্রকাশ এবং ভাষা, সাংস্কৃতিক, দার্শনিক বিকাশ ও ধর্মচর্চার স্বাধীনতা সমুন্নত রেখে আত্মপরিচয় ও নৈতিক শক্তিকে দৃঢ় করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

দুই

জালেমি কুশাসনের সর্বব্যাপী বিস্তারে বাংলাদেশের সামগ্রিক জনজীবন আজ স্থবির, ভীতসন্ত্রস্ত। প্রতিটি জনপদই রাষ্ট্র-সন্ত্রাসে ত্রস্ত। আজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব চরম বিপন্ন। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বলতম। সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ’র বাংলাদেশী হত্যা বন্ধ নেই। মিয়ানমারও বসে নেই। লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রিত। ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি বিডিআরে নিয়োজিত ৫৬ জন বীর সেনা

কর্মকর্তাকে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের অতি মূল্যস্ফীতি, আইন শৃঙ্খলার নজিরবিহীন অবনতি এবং নির্লজ্জ দলীয়করণে বিচার ব্যবস্থা বিধ্বস্ত। বে-ইনসাফিতে ডুবে গেছে বিচার ও নির্বাহী বিভাগ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের অমানবিকতা গোটা বিশ্বেই আলোচিত। বিরোধী দল ও মত দমনে জালেম সরকারের খড়গ হামেশাই ব্যবহার হচ্ছে। বিচার-বহির্ভূত হত্যা, গুম আর পুলিশী নির্যাতনে হালে বাংলাদেশ বিশ্ব নিন্দা কুড়াচ্ছে। শেয়ার বাজার থেকে লক্ষ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ৮শ' কোটি ডলার হাতিয়ে নেয়া, চোখ-কপালে ওঠা দুর্নীতির মাধ্যমে ১২ বছরে সাড়ে ১১ লক্ষ কোটি ডলারের পাচার আমাদের দেখতে হয়েছে এবং হচ্ছে। আজ বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভের ঘাটতি হয়েছে ক্ষমতাসীনদের দুর্নীতির দরুন। শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে অসহনীয় নৈরাজ্য। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এখন চরমভাবে পদদলিত। কালো আইনসমূহ যখন তখন ছোবল মারছে। অথচ গণমাধ্যম, সামাজিক ও সুশীল সমাজের বড় অংশ আজ ফ্যাসিবাদের প্রতি সরব-মুগ্ধতায় আবিষ্ট। সংবাদপত্র সমাজ আজ নিবর্তনে অসহায়, খুন-জখমের শিকার হচ্ছে প্রায়শই। জালেম শাসকদের কাছে 'তথ্য' হল এমন বস্তু যা অপরকে ঘায়েল করার জন্য জড়ো করা হয় এবং নিজেদের বাঁচাতে যা অদৃশ্য করে দেওয়া বা গুলিয়ে দেওয়া যায়। ভিন্নমতের কারণে কবি, লেখক, শিল্পী, পেশাজীবীদের গ্রেফতার, চাকরিচ্যুতি, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টসহ বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইনে মামলা নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এক মূর্তিমান আতংক।
সারাদেশে নারীধর্ষণ ও নির্যাতন, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন নারীর জন্যে আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গরিব মানুষ দু'বেলা খাওয়ার জোটাতে পারছে না, যা আয় করছে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্ব গতি তাকে আরো পিছিয়ে দিচ্ছে। প্রবাসে থাকা শ্রমিকেরা কষ্ট করে দিন কাটাচ্ছে, তাদের পাঠানো অর্থে বাংলাদেশ টিকে আছে। অথচ তাদের দেখভালের কোন ব্যবস্থা নেই।

জগদ্বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী রোমাঁ রোলা এবং আঁরি বারব্যুস-এর "মুক্ত মানবাত্মার নিকট আবেদন" (১৯২৭) শীর্ষক খোলা চিঠিকে উদ্দত না করলেই নয়। তারা বলেছিলেন, 'আমরা সর্বত্র লক্ষ করছি, ফ্যাসিবাদের নামে স্বাধীনতার সমস্ত বিজয়কে হয় ধ্বংস নতুবা বিপদাপন্ন করা হচ্ছে। সংগঠন গড়ার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশ ও বিবেকের স্বাধীনতা, যা শত শত বছরের আত্মত্যাগ ও আয়াসে অর্জিত হয়েছে, আজ সেই সব কিছুকেই নির্দয়ভাবে নির্মূল করা হয়েছে। এই আত্মিক, মানবিক ও বৈষয়িক দুর্দশা ও দেউলিয়া অবস্থায় আমরা আর নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকতে পারি না। নিস্ক্রিয় ও পক্ষপাতশূন্য থাকা আর নিরাপদ নয়।" আজকের বাংলাদেশে চলমান ফ্যাসিবাদে আমরাও আর নিরুত্তর ও নিশ্চুপ থাকতে পারি না। বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী মাত্রই ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরোধী। অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলাই হচ্ছে উত্তম সংগ্রাম। আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা মানবসমাজের অন্যতম সাধনা হলেও, সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠেছে। এই অমানবিকতাকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাঘাত এবং রুখে দিতে হবে। মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ইনসাফ কায়েমে সোচ্চার হওয়া এখন মূল কর্তব্য।

আমরা মনে করি, ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণতর বিকাশ ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের জন্য সমাজের সর্বস্তরে মুক্ত সংলাপ বাঞ্ছনীয়। রাজনৈতিক পরিসর বলতে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার পরিসরই বোঝায়, যেখান থেকে আধুনিক 'পার্লামেন্ট' ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানের সত্তর অনুচ্ছেদ দিয়ে তামাশা এবং সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্রের ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। দরকার রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরে সাধারণ মানুষের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা বিনিময়ের

গণপ্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলা যা গণশক্তি বিকাশের সামাজিক ও রাজনৈতিক শর্ত তৈরি হয়। মানুষ কথা বলতে সক্ষম একটি প্রাণী এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার মাধ্যমেই রাজনৈতিক পরিসরে তাদের বিরোধ, বিভাজন ও বিভক্তির সমাধান করতে পারে – সেই জন্যই তারা 'রাজনৈতিক প্রাণী' (Political Animal) – এই কথা বহু আগে এরিস্টটল মানবজাতিকে শিখিয়ে গিয়েছেন। ফলে বিভেদ, বিভাজন, জুলুম ও সন্ত্রাসের এই কালপর্ব পেছনে ফেলে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

ফ্যাসিবাদ, ফ্যাসিস্ট শক্তি ও ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থা বাতিলের জন্য বাংলাদেশের মজলুম জনতা আজ জেগে উঠেছে। আর একটি তথাকথিত 'গ্রহণযোগ্য নির্বাচন'-এর মাধ্যমে পুরাতন বা নতুন ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান যেন না ঘটে, তার জন্য জনগণকে সচেতন করা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মানুষের মধ্যে আজ যে সাড়া, উদ্দীপনা ও আশার আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাকে রাজনৈতিক রূপ দিতে হবে। যদি জনগণের গণতান্ত্রিক অভিপ্রায়ের যথার্থ বাস্তবায়নে আমরা ব্যর্থ হই, আগামী পঞ্চাশ বছরেও আমাদের দুঃসহ দুর্দশা ও গোলামির শেষ হবে না। আমরা অসহায়ের মতো খাবি খেতে থাকব।

ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম সামগ্রিকভাবে আমাদের গণমানস, আত্মিক ও সাংস্কৃতিক পরিগঠন এবং নৈতিক জগত নির্মাণে ভূমিকা রাখে। অথচ আমরা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের কৃত্রিম, অনর্থক ও আত্মঘাতী বিরোধ জারি রাখছি। রাজনৈতিক জনগোষ্ঠি হিসাবে আমাদের বিকাশের ক্ষেত্রে সেটা প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছে। কোরানুল করিম আমাদের কিছু নৈতিক-রাজনৈতিক শিক্ষা দেয় যা একালে কলোনিয়াল, সাম্রাজ্যবাদী এবং আধুনিক পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণা পর্যালোচনার শক্তি জোগায়। কেন্দ্রীভূত ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রশক্তির বিপরীতে জনগণের গণতান্ত্রিক ক্ষমতা বা গণশক্তির বিকাশের নীতি ও কৌশল নিয়ে ভাবতে গেলে সেই সকল নৈতিক-রাজনৈতিক শিক্ষা নিয়ে অবশ্যই আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। কোরানুল করিম আমাদের যে শিক্ষা দেয় বহু দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আমাদের তা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তার সহজ সার কথা হচ্ছে আল্লাহ কোন সার্বভৌমত্বের দাবিদার কোন জালিম ও ফ্যাসিস্ট শক্তি সহ্য করেন না।

পৃথিবীতে সব থেকে বড় বিপদ হচ্ছে এমন সব লোকের মধ্যে বেঁচে থাকা যারা নিজেদেরকে বা কোন ব্যক্তিকে বা কোন শ্রেণীর মানুষকে 'সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক' মনে করে। এরপর তাদেরকে বাস্তব ও সার্বিক আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী মনে করে। বাংলাদেশে সেটা শুধু মনে করার বিষয় হিসাবে নয়, সাংবিধানিক ভাবেই সেটা কায়েম রাখা হয়েছে। এই ফেৎনা জনগণকে বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত করে ফেলে। কারণ প্রকাশ্যে তারা মানবতা দেখতে গিয়ে নিজেদেরকে এক জাতি বা এক মানবগোষ্ঠী বলে প্রকাশ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে এক দল আর এক দলকে গোলাম বানিয়ে রাখতে চায় এবং তারা কেউ কেউ ক্ষমতায় জেঁকে বসে থাকে এবং সে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখার জন্য যে কোন হীন পন্থা গ্রহণ করতেও কসুর করে না। ইসলাম সকলকে একই মানব জাতির অংশ গণ্য করে। এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের ওপর শ্রেষ্ঠ গণ্য করে না। প্রতিটি জনগোষ্ঠির কাছে আল্লার তরফ থেকে পথ প্রদর্শক এসেছেন। কিন্তু বিবাদ ও ফেৎনা তখনই শুরু হয় যখন কেউ কেউ নিজেদের সার্বভৌম শক্তি গণ্য করে এবং অন্যদের ওপর নিজেদের বিধান চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। এদের কারো কারো মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ এবং অপরের জন্য পতন এবং অকল্যাণ কামনা বিষের মতো কাজ করে; তারা উভয়েই এসব মন্দ বাসনা-কামনার কুফল ভোগ করে। এর ফলে না পারে তারা একে অপর থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে, তেমনি একসঙ্গে বসবাসও করতে পারে না, পৃথক বা পৃথককীরণের

মধ্যে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র বজায় রেখে সুখ-শান্তি নিয়ে নিজেরা বসবাস করতেও অক্ষম হয়ে পড়ে। পরস্পর মিলেমিশে থাকার মধ্যে যে গভীর সামাজিকতা তার মর্ম তারা ধরতে পারে না। গোটা বিশ্বের জনগণ আজ ধীর অথচ দীর্ঘস্থায়ী এই কঠিন অনৈক্য তথা অশান্তির আযাবে আবদ্ধ হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে একাত্তরে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশের জনগণ কিভাবে নিজেদের রাজনৈতিক ভাবে গঠন করলে বর্তমান বিশ্বের জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তন ও বাংলাদেশে চলমান ফ্যাসিবাদের অবসান ঘটাতে পারবে? কিভাবে জীবনধারণের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামে জয়ী হয়ে স্বাধীন রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসাবে টিকে থাকতে পারবে, এটাই এ মুহূর্তের প্রধান জিজ্ঞাসা। তাই আমরা মনে করি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের পূর্ণতর বিকাশ এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে সর্বস্তরে আলোচনা ও তৎপরতা জোরালো করা প্রয়োজন। তাহলেই কেবল ফ্যাসিবাদ, ফ্যাসিস্ট শক্তি ও ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থা বাতিল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা বাংলাদেশকে নতুন ভাবে গড়তে এবং বিশ্ব সভায় নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হব। আমাদের রয়েছে বিশাল কিশোর কিশোরি , তরুণ তরুণীদের সংখ্যা। তারাও আজ বাংলাদেশকে নতুন ভাবে গড়তে আগ্রহী। তাদের জন্য আগামি বাংলাদেশ গড়ে তুলবার ভিত্তি নির্মাণ এখন আমাদের প্রধান রাজনৈতিক কর্তব্য।

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যর্থতা শুধুমাত্র রাজনীতিকদের দোষ এটা আমরা মনে করি না। একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক গঠন সমাজের সামগ্রিক বুদ্ধি বৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। এর সঙ্গে ধর্মের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। আমরা চাই বা না চাই ধর্ম সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

আমাদের উপলব্ধি ও প্রস্তাব

আমরা মনে করি বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি, ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং ইউক্রেন যুদ্ধসহ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী দেশগুলোর মধ্যে সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সচেতন ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নাগরিকদের অবিলম্বে সংগঠিত হওয়া দরকার। এর আগে আমরা ‘নাগরিক অধিকার বিষয়ক জাতীয় কমিটি’ (National Committee for Civil Rights) গঠন করে কিছু কাজ করবার চেষ্টা করেছি। নানান প্রতিকুলতার জন্য আমরা সেই আন্দোলন যথেষ্ট বেগবান করতে পারি নি।

তখন আমরা প্রধানত নাগরিক অধিকারকেই বিশেষ জোর দিয়েছিলাম। তবে আন্তর্জাতিক দিক থেকে – বিশেষত জাতিসংঘের বিভিন্ন সনদ ও ঘোষণার প্রেক্ষিতে ‘অধিকার’-এর ধারণা এখন অনেক বেশী সম্প্রসারিত এবং বাংলাদেশের মতো দুর্বল দেশের জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ও কৌশলগত হাতিয়ার। সেই দিক থেকে আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত সকল সার্বজনীন নাগরিক ও মানবিক অধিকার রক্ষার কাজকে জাতীয় ও বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থের দিক থেকে খুবই জরুরী মনে করি। বাংলাদেশের সমস্যা শুধু নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে সীমিত নয়, মূলত মানবাধিকারের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের কাজ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা Universal Declaration of Human Rights (UDHR 1948) মানবাধিকারের ইতিহাসে একটি মাইলফলক দলিল। বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলের বিভিন্ন আইনি ও সাংস্কৃতিক

পটভূমির প্রতিনিধিদের দ্বারা ঘোষণাটি ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে প্যারিসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রেজুলেশন 217 A (III) দ্বারা সমস্ত মানুষের জন্য অর্জনের একটি সাধারণ মানদণ্ড হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রথমবারের মতো মৌলিক মানবাধিকারগুলিকে সার্বজনীনভাবে সুরক্ষিত করার নির্দেশ দেওয়াটা আন্তর্জাতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নিশানা। এটি অনেক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র এবং বিজয়ী গণভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত দেশের গঠনতন্ত্র প্রণয়নে ভূমিকা রেখেছে। আমরা মনে করি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রেই সার্বজনীন অধিকার ও আইন সম্পর্কে সচেতন, ও শিক্ষিত করে তোলা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

উল্লেখ করা দরকার বাংলাদেশে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে কিছু কাজ হয়েছে, কিন্তু অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার নিয়ে প্রায় কোন কাজই হয় নি। আমাদের রাজনীতিও সে কারণে বন্ধ্যা ও অদূরদর্শী। ফ্যাসিস্ট শক্তি সহজেই বাংলাদেশে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পেরেছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৭৬ সালে কার্যকর হয়।

সার্বজনীন মানবাধিকার এবং অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘোষণা ও সনদের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে কাজের প্রস্তাব করছি তা নিম্নরূপঃ

১. একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জনগোষ্ঠি হিসাবে বিশ্ব সভায় বাংলাদেশের আবির্ভাবের তাৎপর্য ও শক্তি ভাষা, সংস্কৃতি এবং ধর্মসহ সকল দিক থেকে নিজেদের উপলব্ধি করা, জনগণকে সচেতন করা এবং তাদের রাজনৈতিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় তারা কিভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে সে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ দেওয়া। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠিকে সকল নিপীড়িত জনগোষ্ঠির মিত্র হিসাবে গড়ে তোলা। ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আলোকে বাংলাদেশের জনগণকে সঠিক অবস্থান নির্ণয়ে সদাসর্বদা সচেষ্ট থাকা।

২. ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যে অনর্থক বিরোধ ও ভেদ বুদ্ধির রাজনীতি জারি রেখে বাংলাদেশের জনগণকে বিভক্ত ও বিভাজিত রাখার হীন কৌশল থেকে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি কাজ। রাজনৈতিক জনগোষ্ঠি হিসাবে নিজেদের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন করা এখনকার প্রধান কর্তব্য।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিভাজনের ভেদরেখা খুবই স্পষ্ট। একদিকে ফ্যাসিস্ট শক্তি এবং তাদের সমর্থক আর বিপরীতে বাংলাদেশের জনগণ। 'জনগণ' বলতে আমরা বাংলাদেশের ফ্যাসিস্ট শক্তি ও ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিরোধী জনগণ এবং তাদের বিভিন্ন আন্দোলন, বিবিধ সংগঠন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বুঝি। তাদের মধ্যে কৌশলগত পার্থক্য থাকলেও নীতিগত ঐক্য রয়েছে। সেটা হোল ফ্যাসিস্ট শক্তি ও ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থা উৎখাত করে বাংলাদেশকে নতুন ভাবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ইনসাফের ভিত্তিতে 'গঠন'। জনগণের মধ্যে চিন্তার অস্পষ্টতা থাকতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থের কোন বিরোধ নাই। ফ্যসিস্ট ক্ষমতা ও ব্যবস্থা থেকে জনগণের মুক্তি, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও মানবিক অধিকার কায়েম এবং স্বাধীনতার তিন নীতি সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার বা ইনসাফ কায়েমের জন্য উপযুক্ত গণশক্তি ও বাংলাদেশকে রাজনৈতিক ভাবে 'গঠন'-ই আমাদের এখনকার প্রধান কাজ।

৩. বিশ্ব সমাজের অংশ হিসাবে নাগরিক ও মানবিক অধিকারের বিভিন্ন বৈশ্বিক ঘোষণা ও সনদ বা আন্তর্জাতিক বিধি বিধান, নীতি ও সম্মতি বাস্তবায়ন করা এবং বাংলাদেশের সকল পর্যায়ে নাগরিক ও মানবিক অধিকার আন্দোলনকে শক্তিশালী করাই হবে আমাদের কাজের প্রধান দিক।

৪. আর্থ-সামাজিক জীবন–বিশেষত জীবন ও জীবিকার সমস্যা মোচন, প্রাণ-প্রকৃতি ও পরিবেশ ধ্বংস ও জলবায়ু বিপর্যয় অবিলম্বে বন্ধ, বীজ ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব অর্জন, নারী-পুরুষের মধ্যে ক্ষমতা ও সামাজিক অবস্থানের ভেদ ও অসম সম্পর্ক মোচন এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের দ্রুত ও ত্বরান্বিত অর্থনৈতিক বিকাশের সঠিক জাতীয় নীতি ও কৌশল নির্ণয়ে জনগণকে বিপুল ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং সরাসরি অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠনিক সুযোগ সৃষ্টি করা আমাদের এখনকার প্রধান কাজ। এই ক্ষেত্রে নিজেরা ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাক্তি, আন্দোলন ও সংগঠনের কাজে আমরা সহযোগী থাকব। রাজনৈতিক সংকট মোচনের পাশাপাশি আমরা সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের বেঁচে থাকার সংকট মোকাবিলার – যেমন পানি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান ইত্যাদির নিশ্চয়তা বিধানের প্রতি আমরা একনিষ্ঠ ভাবে মনোযোগ দিতে চাই।

আমাদের আশু লক্ষ্য

১. যথাসম্ভব বৃহত্তর ঐক্যের ভিত্তিতে যৌথ কিংবা যুগপৎ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। আন্দোলন-সংগ্রাম তখনই পরিণতি লাভ করবে যদি তা জনগণের বিজয়ী গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং ফ্যাসিস্ট শক্তি ও ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থা উৎখাত করে জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল ছোট বড় সকল দলকে নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করা না গেলে গত কয়েক দশকে গড়ে ওঠা সুবিধাবাদী, সন্ত্রাসী ও লুটেরা শক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে না। ফ্যাসিস্ট শক্তি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাবিরোধী জনগণের বিজয় ছাড়া ফ্যাসিস্ট শক্তির কবল থেকে জনগণ কখনই মুক্তি পাবে না, নানান রূপে তা আবার বারবারই ফিরে আসবে। আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের বিজয় নিশ্চিত না করে তথাকথিত জাতীয় বা অন্তবর্তী সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখে ক্ষমতা লাভের খায়েশ মাত্র।

২. জনগণের বিজয়ী গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ হবে বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী একটি নতুন ‘গঠনতন্ত্র’ প্রণয়ণের জন্য কাজে হাত দেওয়া। শান্তি-শৃঙ্খলা ও জাতীয় প্রতিরক্ষার অংশ হিসাবে শক্তিশালী গণপ্রতিরক্ষার ব্যবস্থা কায়েমের মধ্য দিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে যেন কোন ষড়যন্ত্র হতে না পারে সে জন্য আইনরক্ষী, সুবিধাভোগী ও আমলাদের মধ্যে গণবিরোধীদের শনাক্ত করা। দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করা, লুটে নেওয়া বাংলাদেশের জনগণের অর্থ ও সম্পদ উদ্ধারের ব্যবস্থা করা, অবিলম্বে স্থানীয় সরকারের পুনর্গঠনসহ খাদ্য, পুষ্টি, আবাস, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৩. এরপর অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ হচ্ছে গঠনতন্ত্র প্রণয়ন সভা (constituent assembly) আহবান করা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে নতুনভাবে গঠন (constitution) করা। নতুন গঠনতন্ত্রে

স্বাধীন, নিরপেক্ষ শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা নিশ্চিত করবার জন্য নির্বাচনের সময় সকল নির্বাহী ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকবে।

৪. নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়নের পরপরই অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকার পদত্যাগ করবে এবং নতুন গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে নতুন জাতীয় নির্বাচন হবে।

জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে নতুন ভাবে বাংলাদেশ গঠনের এটাই সঠিক পথ। আমরা সকলকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার কিংবা পাশাপাশি কাজ করার আহ্বান জানাই।

তারিখ: 16-3-2023